



বৌদ্ধধর্ম

গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। যখন ধর্মের ক্ষেত্রটি হল অবনমিত ও অথহীন আচারসর্বস্ব, তখন বুদ্ধ এসেছিলেন তাকে সংস্কার করে তাতে নতুন জীবন সঞ্চার করবার জন্য।

বৌদ্ধধর্ম ছিল আচারসর্বস্বতা থেকে মুক্ত। বুদ্ধ নিজস্ব কোনও নতুন ধর্মের প্রবর্তন করতে চাননি। তিনি ধর্মকে জড়তা এবং প্রাচীনতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। ‘কোনও অনুশাসন বা প্রাচীন শিক্ষার দ্বারা চালিত হয়ে না। যদি দেখো কোনও শিক্ষা হিতকারী নয় এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা লোকসান এবং দুঃখকেই ডেকে আনে—তাহলে তাকে পরিত্যাগ কোরো’, —এই ছিল বুদ্ধের অভিযোগ।

বৌদ্ধধর্মে আত্মপ্রচেষ্টার উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দৈববাদীদের বক্তব্যকে বুদ্ধ নস্যাই করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘বুদ্ধগণ কেবল পথনির্দেশ করতে পারেন। কিন্তু তোমার মুক্তির পথ তোমাকেই পরিশ্ৰম করে তৈরি করতে হবে।’

বৌদ্ধধর্মে অলৌকিকতার কোনও স্থান নেই। সবরকম অনুমান, ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্বাভাস দেওয়াকে বুদ্ধ নিয়ন্ত্রণায়ের বলে নিষ্দা করেছেন। যদিও তিনি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন যে, মানবমনের দ্বারা অতিলৌকিক শক্তি অর্জন সম্ভবপুর তথাপি তিনি তাঁর অনুগামী সন্ন্যাসীদের ঐসবের সম্পর্কে আসতে নিষেধ করেছিলেন।

মূল বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১। এটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। এর আগে কখনও ধর্ম প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদের প্রতি এত দ্ব্যুত্থান আবেদন নিয়ে উপস্থাপিত হয়নি। এখানে প্রতি প্রশ্নে আপন অভিজ্ঞতাই ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষার ক্ষেত্র।

২। এটি বৈজ্ঞানিক। জীবনের অভিজ্ঞতাই এই ধর্মের চূড়ান্ত পরীক্ষা এবং এই ধর্ম সেই অভিজ্ঞতাতে কার্যকারণ সম্বন্ধকেই প্রাধান্য দিয়েছিল।

৩। এটি সর্বোৎকৃষ্ট বাস্তবধর্ম—যা শুধু দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলিকেই নির্দেশ করে না, তাদের সমাধানের উপায়ও বলে দেয়।

৪। এটি আরোগ্যকারী। বুদ্ধের ভাষায়—‘আমি একটা জিনিস শিক্ষা দিই—দুঃখভোগ এবং দুঃখভোগের অবসান’ অর্থাৎ ব্যাধি এবং তার নিরাময়।

৫। এটি মনস্তাত্ত্বিক। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ মানবসমাজের সমস্যা নিয়েই শুরু করেছিলেন এবং সেগুলির সম্মুখীন হ্বার পছ্নাও নির্ধারণ করেছিলেন।

৬। এটি সাময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সময়ে কেউ না বললেও তিনি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে, স্ত্রীজাতি পুরুষের মতোই আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে। জাতিভেদেপ্রথানুযায়ী বংশানুক্রমিক কুশলতার ধারণাকেও তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। যদিও তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তথাপি তাঁর স্বভাবানুযায়ী তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু জাতিভেদের গণ্ডি ভেঙে তিনি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে তাঁর সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন।

৭। বৌদ্ধধর্ম ব্যক্তিমানবের জন্য প্রচারিত হয়েছিল। মানুষের সামাজিক দিকটা বুদ্ধদেব অগ্রাহ্য করেননি; তিনি কেবল ধর্মীয় সভ্যর্হ স্থাপন করেননি—সঙ্গের দ্বারা মানবের ব্যক্তিগত সমস্যাদির সমাধানের উপরও জোর দিয়েছিলেন। প্রত্যেককে নিজস্ব পরিস্থিতি এবং দুরবস্থার মোকাবিলা করে আলোকপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হতে হবে।

ত্রিরত্নে খচিত বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধ, ধর্ম আর সভ্য। বুদ্ধের মহাজীবন তাঁর ধর্মের প্রধান অবলম্বন। যে বৈদিক ও ঔপনিষদিক ব্রাহ্মণধর্মের ভাব, রস, আলো ও দর্শনে তাঁর প্রাণধারা সংজীবিত, বৰ্ধিত এবং ফলবান হয়েছিল, তা একান্তভাবেই আর্যধর্মের, আর্যদর্শনের সাধনার ফল। বুদ্ধের চতুরঙ্গ সত্য তাই মূলত আর্যসত্য। বৌদ্ধধর্মের একটি বড় কথা জগ্যান্তরবাদ। এক্ষেত্রেও আর্যসত্যের কাছে গৌতম বুদ্ধের ঝণ সুস্পষ্ট।

চার আর্যসত্য আর আর্য অষ্টাঙ্গিক মাগ—গৌতম বুদ্ধের ধর্মের এই হল মূলকথা। চতুরঙ্গ আর্যসত্য হল : (১) দুঃখজ্ঞান (বা, দুঃখের স্বরূপ); (২) দুঃখের কারণ জ্ঞান (বা, দুঃখের উৎপত্তি); (৩) দুঃখের নিরোধ জ্ঞান (বা, দুঃখের বিনাশ) এবং (৪) দুঃখ নিরোধের উপায় (বা, দুঃখ ধ্বংসের উপায়) অর্থাৎ পথের জ্ঞান। এই চার আর্যসত্যকে বুদ্ধ ‘ব্রহ্মায়ান’ বা

‘ধর্ম্যান’ বলেছেন। সম্মোধিলাভের পর থেকে পরিনির্বাণলাভ পর্যন্ত যা তিনি সূত্র ও গাথায় ব্যাখ্যা করেছেন, সে সবই এই চতুরঙ্গ আর্যসত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। গভীর সমাধিতে এই চতুরার্থ-সত্ত্ব উপলক্ষি করে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ বা তথাগত নাম ধারণ করলেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবের সমস্ত ব্যাপারটাই দুঃখময়। এই দুঃখের কারণ নিশ্চয়ই আছে। দুঃখের কারণ কি? তৃষ্ণ (তন্হা) বা বাসনা। এর আত্যন্তিক নিবৃত্তিতেই দুঃখের নাশ—কারণের নাশে কার্যের বিনাশ। উপায়? উপায় হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ: (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকলন, (৩) সম্যক বাক (সত্ত্ব, সরল, প্রিয়বাক্য বলা), (৪) সম্যক কর্মান্ত (সৎ আচরণ), (৫) সম্যক আজীব (সর্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধু জীবিকা), (৬) সম্যক ব্যায়াম (আত্মসংযম বা আত্মোৎকর্ষ), (৭) সম্যক শ্মৃতি (ধারণা ঠিক রাখা), (৮) সম্যক সমাধি (ধ্যান, মনন, নির্দিধ্যাসন)। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বুদ্ধদেব বলেছেন, ‘ব্রহ্মচরিয়ৎ’ বা ব্রহ্মচর্য। আবার চিত্তের পরম একাগ্রতারূপ সমাধিকেও তিনি বলেছেন সম্যক সমাধি। বেদ বা উপনিষদে এই আর্য-ব্রহ্মচর্যই ব্যাখ্যাত হয়েছে ভিন্ন নামে আর বুদ্ধের পূর্বে অতীতকালেও এই আর্যসত্ত্ব লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ ভারতবর্ষে বিরল ছিল না। সম্যক সমাধি খুব বেশিরকম ভাবে হিন্দুধর্মের রাজযোগ প্রদর্শিত পন্থাগুলির সদৃশ এবং উভয়ের লক্ষ্য একই। তবে যা ছিল আর্যস্থাষিদের ধারণার সামগ্ৰী, তাকেই বাস্তব করে তুললেন বুদ্ধদেব, প্রত্যক্ষ করলেন নিঃসংশয়ভাবে এবং সার্থকভাবে প্রয়োগ করলেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে। বুদ্ধের বুদ্ধস্তু এইখানেই।

বৌদ্ধধর্মের আর একটি অঙ্গ ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মবিহারের লক্ষণ বৌদ্ধশাস্ত্রে এই ভাবে দেওয়া হয়েছে: মা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের সন্তানকে রক্ষা করেন, ঠিক তেমনই সকল প্রাণীর উপর অপরিমিত দয়াভাব দেখাবে। উত্থর্ব, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শক্রতাশূন্য মনে অমিত করণ দেখাবে। কি দাঁড়াতে, কি চলতে, কি কথা বলতে, কি শুতে, যতক্ষণ নিন্দিত না হবে, এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকবে। এইটিই ব্রহ্মবিহার। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা—এই চার রকম ব্রহ্মবিহারের কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে। পাতঙ্গল যোগদর্শনেও আমরা এর উল্লেখ পাই।

ଜନସାଧାରଣ ସଥିନ ନିଜେଦେର ଦ୍ୱାରା ଆର ସଂଶୟ ନିଯେ ସ୍ଵଯଂ ବୁଦ୍ଧଦେବେର କାହେ ଉପାସ୍ତିତ ହେଁଛିଲ ତଥନ ତିନି ଉତ୍ତରେ ଯା ବଲେଛିଲେନ ତା ତା'ର ବାଣୀର ସମ୍ୟକ ପରିଚାୟକ । ତାରା ଜିଞ୍ଜାସା କରେଛିଲ, ‘ଆପନି କି ଈଶ୍ଵର?’ ‘ନା ।’ ‘କୋନୋ ଦେବତୃ?’ ‘ନା ।’ ‘କୋନୋ ସାଧୁ—ମହାଆ ?’ ଆବାର ଉତ୍ତର, ‘ନା ।’ ତଥନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଲ, ‘ତବେ ଆପନି କି ?’ ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦିଲେନ, ‘ଆମି ବୁଦ୍ଧ ।’ ବୁଦ୍ଧର ଉତ୍ତରେଇ ତା'ର ସ୍ଵରଗ ପ୍ରକାଶିତ ହେଁଛିଲ । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଯ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ଜାଗରିତ ହୋୟା ଏବଂ ଜାନା । ସେଇ ହିସେବେ ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ‘ଆଲୋକପ୍ରାପ୍ତ’ (ଜ୍ଞାନୀ) ଅଥବା ‘ଜାଗରିତ’ । ତା'ର ଜୀବନକାଳେ ତା'ର ଆପଣି ସଦ୍ବେଦେ ବରାବର ତା'କେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କପେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହେଁଛିଲ । ସରକ୍ଷେତ୍ରେଇ ତିନି ଏର ପ୍ରତିବାଦ କରେଛେନ ଏବଂ ନିଜେର ମାନବତ୍ରେ ଉପର ଜୋର ଦିଯେଛେନ ।

ସାଧାରଣ ମାନୁଷକେ ବୁଦ୍ଧ କୋନୋ ଜାଟିଲ ତତ୍ତ୍ଵ ଦିଯେ ବିଡ଼ପ୍ରିତ କରେନନି । କେବଳମାତ୍ର ଆଚାର, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ଦାଯିତ୍ବବୋଧ ଆର ସରଜୀବେର ପ୍ରତି ଉଦାର ଭାଲବାସା—ଏହି ସରଳ ପଥେଇ ବୁଦ୍ଧ ଆହୁନ କରିଲେନ ମାନୁଷକେ । ତା'ର ଛତ୍ରଚାଯାଯ ଆଶ୍ରଯ ପେଲ ସମାଜେର ସର୍ବସ୍ତରେର ମାନୁଷ । ତା'ର ସୁଦୀର୍ଘ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଁଛିଲ ମାନୁଷର ହିତେର ଜନ୍ୟାଇ । ଏହିଟିଇ ବୁଦ୍ଧର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମଶିକ୍ଷାର ଉପର ଥେକେ ବ୍ରାହ୍ମଗଦେର ଏକଚତ୍ର ଅଧିକାର ଭାଙ୍ଗତେ ଚେଯେଛିଲେନ ଏବଂ ତା'ର ସଂସ୍କାରେର ଅନେକଟାଇ ଛିଲ କତିପରେର ଅଧିକାର ଥେକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଧର୍ମକେ ସାଧାରଣେର ଅଧିଗମ୍ୟ କରା । ସଥିନ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ମତ କରେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେର ଜନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଗଦେର ମୁଖାପେକ୍ଷା ହେଁ ଥାକତ ତଥନ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସ୍ଵାଧୀନଭାବେ ନିଜସ୍ତ ଧର୍ମାଚାରଣେର ପଥେ ଆହୁନ ଜାନାନ ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ କେବଳ ଯେ ଭାରତବରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଁଛିଲ ତା ନଯ, ସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ତିବରତ, ନେପାଳ, କାବୁଲ, ଗାନ୍ଧାର, ଜାପାନ, ଚୀନ, ମାଧୁରିଆ, କୋରିଆ, ସାଇବେରିଆ, ଖୋଟାନ, ପୂର୍ବତୁର୍କିଶାନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶେଓ ସୁବିଶ୍ଵତ ହେଁଛିଲ । ପ୍ରାୟ ସମ୍ମତ ଭାରତେଇ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେଛିଲ । ଜୀବନନିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଛିଲ ବଲେଇ ସହସ୍ର ଜୀବନେ ସେଇ ଧର୍ମ ଆଲୋଡ଼ନ ତୁଳେଛିଲ । ବୁଦ୍ଧର ଶିକ୍ଷା ସାରବଜନୀନ ଓ ସାରଭୌମ । ମାନୁଷକେ ତିନି ଗୁରୁର ମତୋ ଉପଦେଶ ଦେନନି, ବନ୍ଧୁର ମତୋ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେଛେନ । ବଲେଛେନ—ନିଜେକେଇ ନିଜେର ପ୍ରଦୀପ ହତେ ହବେ, ନିଜେଇ ପାର ହତେ ହବେ ଭବନଦୀ—ଅନନ୍ୟଶାରଣ ହେଁ ଧର୍ମକେ ଦୀପ କରେ ଲାଭ କରତେ ହବେ ସତ୍ୟକେ ।

নির্বাণ—এই একটি কথার মধ্যেই বিধৃত রয়েছে বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম এবং তার দর্শন। বৌদ্ধসাধনার চরম পরিণতি নির্বাণ। নির্বাণের মূর্ত বিগ্রহ বুদ্ধ। নির্বাণ নেতিবাচক নয়। এটি শূন্য নয়। এটি ইতিবাচক। অনিবর্তনীয় আনন্দময় প্রাপ্তি নির্বাণ। তত্ত্বের যে অনলশিখা প্রতিনিয়ত দাউডাউ করে ছলছে, নির্বাণ তারই ক্ষয়। কর্মের বঙ্গনই তত্ত্বের মূল—জগ্ন-জরা-মরণপথ-প্রবর্তক সেই কর্মবন্ধনের ক্ষয়ই নির্বাণ। বুদ্ধ বলেছেন, ‘সারথি যেমন অশুকে দমন করে, সেই রকম যিনি ইন্দ্রিয়কে শাস্ত করেছেন, যিনি নিরভিয়ান ও কল্যাণীন, দেবতারাও তাঁকে সীর্ষা করেন।’ এ অবস্থা আনন্দের, নিরানন্দের নয়।

বেদ যে পদার্থের সম্বন্ধে বলেছেন, ‘বাক্য-মনের দ্বারা যাঁকে প্রকাশ করা যায় না, তিনিই ব্রহ্ম’, নির্বাণও সেই অবাঞ্ছনসংগোচ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই অবস্থাটি অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস ও অনিকেত। এই শূন্যতা নির্বাণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। হিন্দুর ব্রহ্মানুভূতি আর বৌদ্ধের নির্বাণের অবস্থা—দুটি দুই পথের লক্ষ্য। বুদ্ধ বললেন—তত্ত্বার যে নিরোধ, বিরাগ বা বিসর্জন, তাকেই বলে মুক্তি, তাই দুঃখের নিরোধ। এই কামনার নিরোধ হলে আমরা মর্তেই অমৃত লাভ করতে পারি। এই অমৃত-জীবনের জন্যই বুদ্ধের শীল, বুদ্ধের নীতি ও কল্যাণধর্ম। চরিত্রেই মানুষকে বড় করে, দাশনিকতা নয়। সভ্যতার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে বড় দান এই চরিত্র। বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে বড় কথা সেবা। এইখানেই বুদ্ধ ব্রাহ্মণ-শাসিত আর্যধর্মকে বহুদূর অতিক্রম করে চলে গেছেন।

বৌদ্ধসাধনায় শীলসাধন নির্বাণলাভের উপায়। এই সুখকর শীলগুলি চরিত্রকে দ্রঢ়িষ্ট ও বলিষ্ঠ করে তোলে। বুদ্ধ সংযম, ইন্দ্রিয়জয় ও চরিত্রগঠনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্র শুধু বৈরাগ্য নয়—এরই মধ্যে আছে প্রেমময় দয়াদাক্ষিণ্য—মৈত্রীমূলক কল্যাণবৃত। গীতার অনুশাসন আর বুদ্ধের অনুশাসনের মধ্যে বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য। উভয় সাধনাই নিরাসক নির্বাসনা হতে বারংবার উপদেশ দিয়েছে। বুদ্ধের জীবনদর্শনে জীবনকে উপেক্ষা নেই, আছে জীবন-প্রীতি।

বৌদ্ধধর্মে রয়েছে কর্তব্বেরও কথা। সংসারে দৈব বা অকস্মাত বলে কিছু নেই—সবই এক কার্যকারণ শৃঙ্খলে নিবন্ধ। তাই বলা হয়েছে ‘অঙ্গুত্তর নিকায়’ প্রভৃতে, ‘কর্মেই আমার অধিকার, কর্মেই আমার উত্তরাধিকার, কর্মের

দ্বারাই আমার জন্মস্থান নির্ধারণ, কর্মের দ্বারাই আমার জাতি, কর্মের দ্বারাই আমার আশ্রয়।^১ কিন্তু বুদ্ধ মানবাঞ্চাকে কর্মের চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। ঐ শাশ্঵ত প্রবাহ মানুষের প্রজ্ঞার সাহায্যে শেষ হতে পারে।

যুগ-প্রয়োজনে বুদ্ধ বেদের কর্মবাদের (বাহ্য উপকরণের সাহায্যে অন্তরঙ্গে) প্রতিবাদ করেন। বাহ্য কর্মবাদের পরিবর্তে তিনি প্রচার করলেন আন্তর কর্মবাদের। বুদ্ধদেব নৈতিকতার অন্তরের ও বাইরের দুটো দিকের ওপর সমান জোর দিতেন। তাঁর এই নীতিবাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনিই জগৎকে দিয়েছিলেন নৈতিকতার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ধারা।

বুদ্ধ জড়বাদী নাস্তিক নন—নিবৃত্তিমাণী অঙ্গেয়বাদী। বুদ্ধ বেদের কর্মকাণ্ডান্তর্গত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা অস্থীকার করলেন। তিনি চাতুর্বর্ণ-সমাজ-বিধানের বিরোধী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর ধর্মের বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। বুদ্ধ নিবৃত্তিমূলক ধর্ম প্রচার করেছেন—বাসনা ও তৃষ্ণা ত্যাগের দ্বারা সমস্ত দুঃখের আত্মস্তিক নিবৃত্তি হলে পরিণামে নির্বাণের বিমল আনন্দ সম্ভোগ হয়—বৌদ্ধসাধনার এই চরম লক্ষ্য এবং মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধ নিরক্ষুর ও নীরব থাকতেন বলে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, তিনি ঈশ্বরকে অস্থীকার বা অবিশ্বাস করতেন। এই নীরবতার দ্বারা এইটি বুঝতে হবে যে, কতকগুলি সত্য আছে যা মুখে ব্যক্ত করা যায় না, কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়াভূত, সে-সম্বন্ধে সংযতবাক হয়ে থাকাই সরলতা ও প্রকৃত ধর্মপরায়ণতার পরিচায়ক। যে চরম সত্য বাক্য-মন-চিন্তার অতীত, যার সম্বন্ধে মুখে কোনও উপদেশ দেওয়া চলে না বলে উপনিষদ বারবার ঘোষণা করেছেন, বুদ্ধও সেই চরম সত্য সম্বন্ধে নীরব থাকতেন।

বুদ্ধ মানবাঞ্চা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে আঞ্চা বলে কিছু নেই। এই অনাত্মবাদ (অনাত্ম) বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক নিয়মের যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে অনিত্যতা (অনিক)। বাকি দুটি হল দুঃখ এবং অনাত্ম। প্রকৃতিতে সবকিছুই পূর্বমুহূর্তে যা ছিল তার থেকে এই মুহূর্তে সেগুলি ভিন্ন। এর নাম ক্ষণিকবাদ। কালক্রমে এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মতবিরোধ শুরু হল।

প্রথম মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, বুদ্ধ একজন নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেও ভগবান নন, কারণ, ভগবান বলে কোনও কিছুর অস্তিত্বে তাঁদের বিশ্বাস নেই। তাই তাঁরা মৃত্তিপূজার বিরোধী। যদিও পরবর্তী কালে তাঁরা একমাত্র বুদ্ধদেবের পূজাই করেছেন। দ্বিতীয় মতানুসারে বুদ্ধদেব হলেন ভগবান। এঁরা বুদ্ধের পূজাও করেন, আবার অন্যান্য দেবদেবীর পূজাও করেন। প্রথম মতাবলম্বীদের ‘থেরবাদী বৌদ্ধ’ এবং দ্বিতীয় মতের অনুসরণকারীদের ‘মহাযান বৌদ্ধ’ নামে অভিহিত করা হয়।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ধর্মজীবনে ধারাবাহিক ত্রুটিবিকাশের মূল্য বুঝতে অক্ষম ছিল বৌদ্ধেরা। এই জন্য প্রচীন ধর্মের সঙ্গে কোনও সমন্বয়ের চেষ্টাই করেনি বৌদ্ধধর্ম। বৃহৎ বৌদ্ধ আশ্বেলন এই কারণেই নিষ্ফল হল। উপনিষদকে অমান্য করে ভারতে কোনও ধর্ম বা ধর্ম সম্প্রদায় টিকতে পারে না। উপনিষদের প্রতি আনুগত্য দেখাতে না পারায় বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমি থেকে প্রায় নির্বাসিত হল। বুদ্ধদেব নির্বিচারে সকলের জন্য মোক্ষধর্ম প্রচার করার ফলে দেশে উত্তরকালে নানা প্রকার ব্যভিচার দেখা দেয়। পরবর্তী বৌদ্ধমতাবলম্বীদের অত্যধিক দর্শনচিহ্ন বৌদ্ধধর্মের অবনতির আর একটি কারণ। পতনের আরও একটি নিগৃত কারণ ছিল। বৈচিত্রের দেশ এই ভারতবর্ষ—বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে সেই এককে উপলব্ধি করাই ভারতের সনাতন সাধনা। তাই এদেশে অসংখ্য ঘত ও পথ। বুদ্ধ প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে অস্তীকার করলেন। তাই ভারত বুদ্ধ দিয়ে বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করলেও প্রাণের মধ্যে বুদ্ধবাণীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। যে ধর্মের আরন্ত হয়েছিল আচার-অনুষ্ঠানাদি, ভবিষ্যৎকথন, ঈশ্বরকৃপা এবং অলৌকিকতার প্রতিবাদ হিসেবে, সেই ধর্মেই পরিণতিতে এই সবগুলিই অন্তর্ভুক্ত হল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা (যিনি নিরীশ্বরবাদের প্রবক্তা ছিলেন) স্বয়ং ঈশ্বরের পর্যায়ভুক্ত হলেন।

বুদ্ধই জগতে প্রথম গুরু যিনি ধর্মপ্রচার আরন্ত করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বপ্রথমে ধর্মান্তরকরণের পরিকল্পনা করেন। তথাগতের (বুদ্ধ) মহামহিমা এই ছিল যে, সকলের জন্য, বিশেষ করে অজ্ঞ ও দরিদ্রদের জন্য, তাঁর অঙ্গুত সমবেদনা ছিল। তিনি প্রাদেশিক কথ্যভাষায় উপদেশ দিলেন।

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟରା ସେଇ ଉପଦେଶ ସଂକ୍ଷିତେ ଅନୁବାଦ କରତେ ଚାଇଲେ ତିନି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ବଲଲେ, ‘ଆମି ଗରିବଦେର ଜନ୍ୟ, ସର୍ବସାଧାରଣେର ଜନ୍ୟ । ଆମାକେ ଜନଗଣେର ଭାଷାଯ କଥା ବଲତେ ଦାଓ ।’

ଯହି କର୍ମୟୋଗୀ ଛିଲେନ ବୁଦ୍ଧ । ନୈତିକତାର ଏଥିନ ନିଭୀକ ପ୍ରଚାରକ ଜଗଃ ଆର ପୂର୍ବେ ଦେଖେନି । ବେଦ, ବର୍ଣ୍ଣ, ପୁରୋହିତ ବା ପ୍ରଥା କୋନାଓ କିଛୁର ନିକଟ ବୁଦ୍ଧ ମାଥା ନତ କରେନନି । ଆବାର, ବେଦନ୍ତ-ନୀତିକେଇ କାର୍ଯେ ପରିଣତ କରିବାର ଜନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧର ଆବିର୍ଭାବ । ଏକଟି ଛାଗଶିଶୁର ପ୍ରାଗରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ତିନି ନିଜେର ଜୀବନ ଦିତେ ପ୍ରତ୍ୱତ । କୀ ବିଶାଳପ୍ରାଗତା, କୀ ଅସୀମ କରଣ୍ଣ !

ବୁଦ୍ଧର ପ୍ରଧାନ ଓ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛିଲ ଯାତେ ଲୋକେର ବାସ୍ତ୍ଵିକ ଉପକାର ହବେ ତା ବଲା । ତାଇ ବୁଦ୍ଧ କଥନେ ନାନା ବିଷୟେ ଲୋକେର ନିରଥକ କୌତୁଳ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରତେନ ନା । ବୁଦ୍ଧର ଅଳନ୍ତ ଉପଦେଶଗୁଲି ଆଦୌ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବା ଅନୁମାନ-ଭିତ୍ତିକ ଛିଲ ନା, ପରମ୍ପରା ସେଗୁଲି ଛିଲ ବାସ୍ତ୍ଵବଧିରୀ ଏବଂ ନିରାମୟକାରୀ ।

ଇତିହାସେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକେର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକିତ ଆକାଶେର ପଟ୍ଟଭୂମିତେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ହିମାଲୟ ଶିଖରେର ମତୋ ଜାଞ୍ଜଲ୍ୟମାନ । ତାଁର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ଆଜ ଭାରତେର ଜାତୀୟ ପତାକାଯ ବିରାଜମାନ । ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକେ ତିନଟି ମହାଦେଶେ ପ୍ରସାରିତ କରେଛିଲେନ । ତିନି ଏହି ଧର୍ମକେ ଭାରତେର ଏକଟି ସମ୍ପଦାୟ ଥେକେ ବିଶ୍ଵଧର୍ମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେନ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲ କିନ୍ତୁ ଜୟଭୂମିତେ ପ୍ରାୟ ଅବଲୁପ୍ତ ହଲ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକେ ଯତ ନା ପରାଭୂତ କରେଛେ, ତାର ଚେଯେ ବେଶ ଆତ୍ମାକରଣ କରେଛେ । ମୋଟାମୁଠି ୧୦୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅବଧି ଭାରତବରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଅନ୍ୟତମ ଧର୍ମ ହିସେବେ ବିଦୟମାନ ଛିଲ । ଏକଥା ବଲା ଠିକ ହବେ ନା ଯେ, ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀରା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମକେ ବିନଷ୍ଟ କରେଛେ, କାରଣ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଟିକେ ଛିଲ ବା ଆଛେ । ଆସଲ ବ୍ୟାପାର ହଲ, ଦେଡ ହାଜାର ବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ସଙ୍ଗେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଭେଦ ଅନେକ କମେ ଏସେଛିଲ । ବୁଦ୍ଧଦେବେର ଅନେକ ସଂକ୍ଷିରେର ଘୋଷିକତା ହିନ୍ଦୁରା ମେନେ ନେଯ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧସଙ୍ଗେର ପ୍ରଭାବେ ହିନ୍ଦୁ ସାଧୁସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହତେ ଲାଗଲ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଅନେକଗୁଲି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ଆଦର୍ଶ ହିସେବେ ଗୃହୀତ ହେଁଥେ ଯଦିଓ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ଆଚରଣ ହିସେବେ ନଯ । ଏର ମଧ୍ୟେ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟାଗ୍ୟ ହଲ ଜୀବେ ଦୟା, ପ୍ରାଣୀ ବଧ ନା-କରା ଏବଂ ଧର୍ମୀୟକ୍ଷେତ୍ରେ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୀତି ହିସେବେ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାର ହ୍ରାସ ।

ସବଦିକ ଦିଯେ ବଲତେ ଗେଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବକେ ‘ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିପ୍ଲବୀ ସନ୍ତାନ’ ହିସେବେ ଅଭିହିତ କରା ହ୍ୟ; ତାଁକେ ଅବତାରେର ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଉନ୍ନିତ କରା ହ୍ୟାଇଁ ।

থেরবাদীয় বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্যকে অনেকাংশে হিন্দুধর্মের অনৈতিকাদের সমগোত্রীয় বলা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে বুদ্ধের অসীম প্রভাব, স্বামীজী বলেছেন : ‘বৈদিক পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে নবোন্ধিত ক্ষত্রিয়দের বিদ্রোহের নামই বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের পূর্ণ পরিণতি।’

বুদ্ধদেৰ

বুদ্ধেৰ জন্মকাল যিশুখ্রিস্টেৱ জন্মেৰ প্ৰায় পাঁচশো বছৰ আগে অৰ্থাৎ আজ থেকে আড়াই হাজাৰ বছৰেৱও আগেৰ কথা।

হিমালয়েৰ কোলে নেপালে কপিলাবস্তু রাজ্য। রাজ্যেৰ পাশ দিয়ে কুলকুল কৰে বয়ে গেছে রোহিণী নদী। শাক্যবংশেৰ রাজা শুঙ্কোদন প্ৰজাদেৱ নিয়ে সুখে রাজস্থ কৰেন। রাজাৰ দুই রানি—বড়ৱানি মায়াদেবী, ছেটৱানি মহাপ্ৰজাবতী গৌতমী। একদিন মায়াদেবী স্বপ্ন দেখলেন আকাশ থেকে নেমে আসছে সাদা ফুটফুটে ছোট একটি হাতি। তাৰ শুঁড়ে একটি ফুটন্ত পদ। এই হাতিটি রানিৰ শৰীৰে মিলিয়ে গেল। রানি জেগে উঠলেন। স্বপ্নেৰ কথা শুনে রাজা দৈবজ্ঞদেৱ ডাকালেন, দৈবজ্ঞৱা জানালেন যে, এক মহাপুৰুষ শাক্যবংশে জন্ম নেবেন।

বৈশাখী পূৰ্ণিমা। রানি কপিলাবস্তু থেকে কিছু দূৰে দেবদহে তাঁৰ পিত্রালয়ে যাচ্ছেন, পথে লুম্বিনী উদ্যান। রানি এই লতায় কুঞ্জে ভৱা ফুলে ফুলময় বাগানে বিশ্রাম কৰতে নামলেন। আকাশে পূৰ্ণিমাৰ চাঁদ। এমন সময় :

‘আনন্দে মৃহিতা দেবী
পতিতে ধৰিলা কৰে
এক শাল-শাখা সুশোভন,
ক্ষমতা প্ৰসূত হইল পুত্ৰ
ত্ৰিদিব লতায় যেন
ফুটিল প্ৰসূন মনোৱম।’

কত লোক, কত পুৱনাৰী এসে দেখতে লাগল কুমারকে। একদিন ত্ৰিকালজ্ঞ খৰি অসিত দেখতে এলেন রাজকুমারকে। খৰি শুঙ্কোদনকে বললেন—

‘সিন্ধু তব মনোৱথ ; সিন্ধু মনোৱথ
মানবেৰ এতদিনে ; ভক্তিপূৰ্ণমন
ৱাখিও সিন্ধার্থ নাম পিতা শুঙ্কোদন।’

আৱ নামকৰণ উৎসবে দৈবজ্ঞেৱা এসে বললেন—

‘থাকে গৃহাশ্রমে, হবে নৃপতি ধৰার,
হইবে সন্ন্যাসাশ্রমে বুদ্ধ অবতাৱ।’

শিশুর জন্মের সাত দিন পরেই মায়াদেবী শরীর ত্যাগ করলেন এবং বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী মাতৃস্নেহে শিশুকে লালন-পালন করতে লাগলেন। সেইজন্য তার নাম হল গৌতম। তার আরেক নাম ছিল সিদ্ধার্থ।

ধীরে ধীরে শিশু বাড়তে লাগল এবং শুরু হল শিক্ষাজীবন। সেই সময় নামকরা পণ্ডিত ছিলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর কাছে অন্যান্য রাজকুমারদের সঙ্গে সিদ্ধার্থের পড়া শুরু হল। বালকের প্রথম বুদ্ধি, আশৰ্চ স্মৃতিশক্তি দেখে গুরু অবাক হলেন। ললিতবিস্তরে কথিত আছে সিদ্ধার্থ চৌষট্টি প্রকার লিপি ও নানাপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করেন। রণবিদ্যায়ও অতীব কুশলতা লাভ করেন।

মৃগয়ায় পূর্ণ সামর্থ্য সম্মেও কুমার পশুবধ করতে চাইতেন না। দেখা যেত কোনও পশুপক্ষী তীরবিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হলেও কুমার তার শুশ্রায় করে ছেড়ে দিতেন। একদিন সিদ্ধার্থ বাগানে একা বসে আছেন, এমন সময় নীল আকাশের গায়ে একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কারও হাতের তীরে বিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ছেঁড়া ফুলের মালার মতো একটি হাঁস সিদ্ধার্থের কোলে এসে পড়ল। আহত হাঁসটিকে বুকে তুলে আস্তে আস্তে তীরটি টেনে বার করলেন তিনি। তাকে শুশ্রায় করে ছেড়ে দিলেন।

হলকর্ষণ শাক্যরাজ্যের এক পুরোনো উৎসব। হলকর্ষণ শুরু হল। সবিশ্যয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন কর্ষিত ভূমির উপর বহু মৃত কীট। পাখিরা উড়ে এসে সেই সব নিষ্প্রাণ কীট খাচ্ছে মনের আনন্দে। ব্যাঙ পতঙ্গ ধরে খাচ্ছে আর বিবর থেকে বেরিয়ে এসে সাপ খাচ্ছে সেই ব্যাঙদের। জীব জীবকে বিনাশ করছে। সিদ্ধার্থ স্থির হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন জীবের এই কথা। ভাবতে ভাবতে গভীর অন্তরে ডুবে গেলেন।

রাজা দেখলেন কুমারের দীপ্তি বৈরাগ্যের মূর্তি। তাঁর মনে পড়ল ঋষি অসিতের কথা, আর দৈবজ্ঞদের কথা। রাজা চিন্তিত হলেন। ভাবতে লাগলেন কী করে সংসারের নিগড়ে বাঁধা যায়। মায়ার বাঁধনে ফেলার জন্য রাজা কুমারের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন, স্থির হল দণ্ডপাণির কন্যা গোপার সঙ্গে পরিগঘের কথা। গোপার (যশোধরা) স্বয়ংবরসভা। দেশ-বিদেশের রাজপুত্ররা উপস্থিত। সাত দিন ধরে চলল প্রতিযোগিতা, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হলেন সিদ্ধার্থ। দণ্ডপাণি হষ্টচিত্তে কন্যা সম্পর্ণ করলেন।

রাজা শুন্দোদনের আনন্দের সীমা নেই। পুত্রকে সুখী ও সংসারী করার জন্য পৃথিবীর যা-কিছু রমণীয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাছে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু

নয়নানন্দকর সবই ছড়িয়ে থাকত কুমারের চারিদিকে। আকঠ ভোগের মধ্যেও কুমারের তৃপ্তি ছিল না। অন্তরের বৈরাগ্য অঙ্গাতসারে কুমারকে করত উদাস।

দশটি বছর কেটে গেল। সিদ্ধার্থের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, নাম রাহুল। কিন্তু শৃঙ্খলিত বন্য হাতির চিন্ত যেমন অরণ্যের দিকে ধেয়ে যায়, কুমারও সেরকম চাইলেন ক্রমবর্ধমান মায়ার পাশ কাটাতে। কুমার নৃপতির আঙ্গা চাইলেন রাজ্যবিহারের জন্য। রাজা নিশ্চিন্ত, তাই দিলেন অনুমতি। রাজকুমার অশ্঵বাহিত রথে বের হলেন নগর ভ্রমণে। রাজার নির্দেশে সমস্ত নগর সুসজ্জিত। নগরবাসীদের উপর নির্দেশ—এমন কোনও দৃশ্য যেন কুমারের চোখে না পড়ে যাতে কুমারের সংসার-বিত্তৰ আসে। রাজার চেষ্টা আপাতত সফলই হল। নগর ভ্রমণ করতে করতে গৌতমের মনে হল জীবনে শ্রম, দারিদ্র এবং ক্ষুধা আছে—তবুও জীবন মধুর। কিন্তু এর পরেই—মানুষের চিরস্তন ত্রিবিধ দুঃখ—জরা, রোগ ও মৃত্যু—যেন মৃত্তি ধরে কুমারের সামনে উপস্থিত হল। রাজার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল।

কুমার প্রথমে দেখলেন একজন শীর্ণ অথব বৃন্দ পথ দিয়ে হাঁটছে, মাথায় চুল নেই, মুখে দাঁত নেই, হাত কেবলই কাঁপছে। দৃষ্টিশক্তিইন বৃন্দ কানেও শোনে না। অস্থিচর্মসার একটি দেহ লাঠিতে ভর করে চলছে। সিদ্ধার্থ দৃশ্য দেখে শিহরিত হলেন। সারথি ছন্দক সিদ্ধার্থের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—লোকটি জরাগ্রস্ত এবং এই জরা জগতের সমস্ত প্রাণীজগৎকে একদিন না একদিন গ্রাস করবে। যশোধরা, রাহুল, শুঙ্কোদন, কুমারকেও এই জরা বিকল ও নিষ্ঠিয় করবে। ভয়ে শিউরে উঠলেন কুমার।

এর থেকেও ভয়ানক দৃশ্য এরপরে কুমারের দৃষ্টিপথে পড়ল। একটি জীবন্ত মানুষ, গায়ের চামড়া বিবর্ণ, স্থানে স্থানে তামার রং ধরেছে। আবার কোনও অঙ্গ গলে পড়ছে। কী বীভৎস দৃশ্য ! সাধারণ মানুষ ঘৃণায় দূরে সরে যায়। কুমার করণ্যায় আর্দ্র হয়ে ছন্দককে প্রশ্ন করলেন। ছন্দক উত্তর দিলেন—লোকটি কুঠরোগী এবং এর নাম ব্যাধি। সুন্দর সুপুষ্ট শরীরে কেমন করে ব্যাধি আসে, কেউ জানে না, শরীর ধারণ করলেই এই ব্যাধি হয়। নীরোগ মানুষ জগতে বিরল। সিদ্ধার্থ হলেন আতঙ্কিত। মানুষের এত ঐশ্বর্য, এত সম্পদ, এই সম্পদগ্রহণস্পৃহা সবই এই ব্যাধির জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ ভোগ করতে পারবে না। তাহলে এসবের প্রয়োজন কি ?

এর পরের দৃশ্যে সিদ্ধার্থ হলেন হতবাক। সিদ্ধার্থ দেখলেন জীবনের স্পন্দনহীন মানুষের এক মৃতদেহ। এই মানুষের সমস্ত আশা, কামনা, বাসনা, সমস্ত আনন্দ চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে গেছে। কুমার বিচলিত হলেন। দৃশ্যে—গঙ্গে—ভূমি জগৎ, কল্পনার আভায় উজ্জ্বল জীবন যে ভোজবাজি, স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা। তাহলে সবই কি ভোজবাজি? কুমার আর ভাবতে পারছেন না। এই মিথ্যার পারে, জরা, ব্যাধি ও মরণের পারে যাওয়ার মানুষের কি কোনও উপায় নেই? এমন সময় চোখে পড়ল এক অপূর্ব দৃশ্য—সামনে সৌম্য ও মাধুর্যমণ্ডিত দিব্যদর্শন এক সন্ন্যাসী। কুমার প্রশংস করলেন—এই প্রশান্তচিত্ত শান্ত পুরুষ, নয়ন কথনও উদ্ধৃদিকে তোলেন না, কেবল সম্মুখস্থ চারিহস্ত পরিষিত ভূমি অবলোকনপূর্বক গমন করছেন, কাষায় বস্ত্র এর পরিধানে, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে প্রশান্তভাবে বিচরণ করেন, উদ্ধত বা অবিনীত নন—কে এই পুরুষ? ছন্দক উন্তর দিলেন—তিনি ভিক্ষু। তিনি সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ করেছেন, সুবিনীত এর আচরণ। রাগ, দেষ কিছু নেই। তিনি ভিক্ষাম্ভে জীবন ধারণ করেন। কুমার যেন পথের সঙ্কান পেলেন। সিদ্ধার্থ স্মরণ করলেন পণ্ডিতদের কথা, জ্ঞানীদের কথা—প্রবর্জ্যায় সুখ আছে।

চিন্তামগ্ন রাজকুমার বিষণ্ণনে রাজপ্রাসাদে এসে পিতার ঘরে প্রবেশ করলেন। পিতা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সিদ্ধার্থ কৃতাঞ্জলিপুটে পরিরাজক—জীবনের জন্য অনুমতি চাইলেন। চলল পিতা—পুত্রের যুক্তির বাণ—নিষ্কেপ। শেষে রাজা নিরস্ত হলেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে উদ্বারের উপায় রাজা দিতে পারলেন না।

চিন্তাক্লিষ্ট বিশাদগ্রন্থ কুমার ফিরলেন ঘরে, সেখানে ডুবে গেলেন জীবন, মৃত্যু ও ধর্মসের চিন্তায়। চিত্তের একাগ্রতায় খুঁজতে লাগলেন পথের সঙ্কান। তীব্র ব্যাকুলতায় তাঁর কাটল মোহ। রাজস্ত, রাজপ্রাসাদ, পিতামাতা, পঞ্চী যশোধরা, নবজাত শিশু রাহুল—সকলের মায়া কাটাবেন। তিনি হবেন ঘোহমৃত্যু। মহাবোধিলাভের জন্য তিনি স্থির করলেন—সংসার ত্যাগ করবেন। সন্ন্যাসী হবেন।

সেদিন বৈশাখী—পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নায় সারা প্রথিবী ভরা। কুমার গৃহত্যাগ করলেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে বৈশালীর রাজপথে চলেছেন সৌম্যমৃতি সিদ্ধার্থ। তত্ত্বজ্ঞাসু হয়ে উপস্থিত হলেন ভাগ্ব মুনির আশ্রমে। কুমারের জিঞ্জাসার

উত্তর এখানে মিলল না। এরপরে এলেন আড়ার কালামের আশ্রমে। কালামের নিকট শুনলেন জ্ঞানের প্রক্রিয়া। এখানেও মন ভরল না। এই আশ্রম ত্যাগ করে চললেন শ্রাবণ্তীর পথে। শ্রাবণ্তীতে ছিলেন এক তপস্থি। রংজক তাঁর নাম। সেখানেও সিদ্ধার্থের মনের ক্ষুধা মিটল না। তিনি শ্রাবণ্তী হেঁড়ে চললেন রাজগৃহের পথে।

রাজগৃহ থেকে কুমার-সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে পৌছলেন বর্তমান বোধগয়ার নিকট উরুবিক্ষ গ্রামে। পাশেই নৈরঞ্জনা নদী। এরই তীব্রে আরম্ভ হল সিদ্ধার্থের সুদীর্ঘ তপস্য। না খেয়ে, কখনও বা একমুষ্টি তঙ্গুল খেয়ে, কঠোর তপস্যায় কুমারের শরীর ঋংসপ্রায় হল।

এই ভাবে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যায়ও বোধিলাভ হল না—বরং শরীর ঝাঁপিতে ভেঙে পড়ল। এবার যোগাসন ত্যাগ করে নৈরঞ্জনায় মান সেরে বসেছেন, এমন সময় শ্রেষ্ঠী-কন্যা সুজাতা এই যোগীকে বনদেবতা-জ্ঞানে পরমাণু নিবেদন করলেন। সিদ্ধার্থ এই দান গ্রহণ করে শরীরে বল পেলেন এবং সিদ্ধির জন্য শপথ নিলেন—

‘ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং

ত্বঙ্গস্থিমাংসং প্রলয়ঃ যাতু ।

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ভাং

নৈবাসনাং কায়মতশলিষ্যতে ॥’

—এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক; চামড়া, মাংস, হাড় লুপ্ত হয়ে যাক; তবু বহুকল্প বোধিকে না পেয়ে এই আসন থেকে আমি কিছুতেই উঠব না।

ধ্যানে বসলেন মহাযোগী। ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য এলো মার, যা মানুষের সংকল্পে বিঘ্ন আনে। বৈরাগ্যের অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল মারের সমস্ত বল-বিক্রম, পরাজিত হল মার।

মারজয়ী সিদ্ধার্থ আবার স্থির হয়ে বসলেন। ধীরে ধীরে অন্তরের সমস্ত সংশয়, অঙ্ককার দূর হল। জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, জ্যোতিতে হৃদয় ভরে গেল। গৌতম বোধিলাভ করলেন। সিদ্ধিলাভ করলেন সিদ্ধার্থ। তাঁর সম্মুখে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর রহস্যাদ্বার উশ্মোচিত হল। সিদ্ধার্থ দেখলেন দুঃখের কারণ কি, দুঃখের হাত থেকে উদ্বারের উপায় কি।

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ। মানুষের দুঃখে কাতর হয়েই সিদ্ধার্থ ভোগবিলাস পরিত্যাগ করেছিলেন। আজ মানুষের দুঃখ নিবারণের পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

বারাণসীর কাছে মৃগদাব (সারনাথ)। শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ পা বাড়ালেন সেই পথে। পাঁচজন শিষ্য—কোগুল্য, বাপা, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশুঙ্গিৎ—দূর থেকে দেখতে পেলেন বুদ্ধদেবকে। কী জ্যোতির্ময় শরীর—সমস্ত দেহ থেকে যেন আভা ফুটে বেরচ্ছে—দুর্লভ জ্ঞানের আভা। বরণ করলেন গুরুকে—শুনলেন অপূর্ব অনুভূতির কথা। শিষ্যরা জানল জীবজগতের কথা, শুনল চার আর্যস্তোর কথা। শুনল ঘধ্যপথ, অষ্টঙ্গিক মার্গ ও নির্বাণ প্রভৃতির কথা। শিষ্যরা গ্রহণ করল নতুন ধর্ম, উচ্চারণ করল—‘ধর্মং শরণং গচ্ছামি।’ গ্রহণ করল বুদ্ধদেবকে নতুনভাবে—তাই উচ্চারণ করল—‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।’ সৃষ্টি হল নতুন সভ্য, শিষ্যরা উচ্চারণ করল—‘সভ্যং শরণং গচ্ছামি।’ জগতের ইতিহাসে এভাবে সন্ন্যাসিসভ্য স্থাপন হল এই প্রথম।

শুরু হল প্রচার-জীবন। সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক বুদ্ধের উদার ধর্মের কথা শুনে সেই ধর্ম গ্রহণ করলেন। তিন মাস সেখানে থেকে তিনি তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন—‘বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়’—এই কল্যাণকর ধর্মের বাণী ছড়িয়ে দিতে।

সারনাথ ছেড়ে বুদ্ধ উপস্থিত হলেন উরুবিষ্ঠে। এখানে কশ্যপ নামে এক সর্বশাস্ত্রবিদ পশ্চিত বাস করতেন। বুদ্ধের নিকট তিনি তর্কে পরামুর্শ হয়ে সমস্ত শিষ্যদের নিয়ে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করলেন। এরপর বুদ্ধ চললেন রাজগৃহের পথে।

রাজগৃহে রাজা বিস্মিল অপুত্রক বলে দেবতার প্রীতির কামনায় আরম্ভ করেছেন বিরাট যজ্ঞ। এই যজ্ঞে হবে বহু পশুবধ। কথা শুনে করুণাঘন বুদ্ধ ব্যথিত হলেন। তিনি এগিয়ে চললেন যজ্ঞভূমির দিকে। সেখানে ছাগশিশুর পরিবর্তে নিজেকে যুপকাট্টে বলি দিতে চাইলেন। সপারিষদ নৃপতি বিস্মিল স্তুতিত হলেন এই তরুণ সন্ন্যাসীর কীর্তি দেখে। পরে রাজা মুগ্ধ হলেন এঁর অপূর্ব ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায়। সমগ্র রাজপরিবার বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করলেন। রাজা বুদ্ধদেবকে বেণুবন দান করলেন।

শাস্ত্রবিদ কশ্যপ ও রাজা বিশ্বসারের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে সারা দেশে এই অপূর্ব সম্মানীয় অঙ্গুত ধর্মের কথা ছড়িয়ে পড়ল। এই সময়ে স্থবির অশ্঵জিতের নিকট উপতিষ্ঠ ও কোলিত নামে দুই বিত্তবান জ্ঞানবান বন্ধু তথাগত বুদ্ধের খবর পেলেন। দুই বন্ধুর আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখে বুদ্ধ প্রীত হলেন, তাঁদের সঙ্গে স্থান দিলেন। এঁদের নাম হল যথাক্রমে সারিপুত্র ও মৌদ্রাল্যায়ন। এঁরা দুজনেই হলেন বুদ্ধের ডান ও বাম হাত। এঁদের উপর তিনি ছেড়ে দিলেন সঙ্ঘ পরিচালনার কাজ।

রাজা শুদ্ধোদনের কানে পৌছেছে বুদ্ধের কথা। রাজা আমন্ত্রণ জানালেন নিজের সন্তানকে। ভিক্ষাপাত্র হাতে সারিপুত্র ও মৌদ্রাল্যায়নকে নিয়ে পুত্র চললেন রাজ-অন্তঃপুরে। রাজা শুদ্ধোদন অভিনন্দিত করলেন পুত্রকে। কিন্তু ভিক্ষাপাত্র দেখে কুমারকে গভীর আক্ষেপে বললেন—এ তো রাজবংশের কাজ নয়। বুদ্ধদেব উত্তর করলেন, তাঁর নতুন জন্ম হয়েছে। তিনি এখন রাজবংশের নন। তিনি এখন বুদ্ধবংশে জগ্নগ্রহণ করেছেন। এই বংশের কুলধর্ম এই। রাজার ভুল ভাঙ্গল, পিতার অহংকার চূর্ণ হল। এবার সামনে এলেন মাতা গৌতমী। আনন্দে অশ্রু ঝরে পড়ছে। বুদ্ধদেব ভিক্ষা চাইলেন। মাতা প্রশ্ন করলেন—কি ভিক্ষা দেবেন? বুদ্ধ বললেন, মন—যে-মন বিশ্বের কল্যাণ কামনা করে। যে-মনের পরিমাণ নেই, গতি নেই, সর্বভূতে তার প্রসার।

এরপরে গোপাদেবী বুদ্ধের চরণ নয়নাক্ষু দিয়ে ভাসিয়ে হৃদয়ের শুদ্ধা নিবেদন করলেন। এল রাঙ্গল। বুদ্ধদেব তাকে আশীর্বাদ করলেন। রাঙ্গল পিতৃধন প্রার্থনা করল। বুদ্ধদেবের আদেশে সারিপুত্র রাঙ্গলকে প্রত্যজ্যার বেশ দিলেন। রাঙ্গল ভিক্ষু হল। এরপরে জ্ঞাতিভ্রাতা নন্দ এবং অনেকে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করলেন।

কপিলাবন্ত থেকে শাক্যমুনিও ফিরে এলেন রাজগৃহে। পথে শ্রাবণ্তীতে পরিচয় হল সুদুরের সঙ্গে। এঁর অপর নাম অনাথপিণ্ড। ধর্মপ্রাণ অনাথপিণ্ড আমন্ত্রণ জানালেন বুদ্ধদেবকে। বুদ্ধদেব রাজি হলেন। জেতবন-বিহারে বুদ্ধদেবের আগমনের পর অনাথপিণ্ড এই জেতবন ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করলেন। অনাথপিণ্ডের কল্যাণ সুপ্রিয়া ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। শ্রাবণ্তীর দুর্ভিক্ষে ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া সেবাকার্য সংগঠিত করেন।

বৈশালীতে দেখা দিল মহামারী। বুদ্ধের পদার্পণে বৈশালী নগরী মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেল। বৈশালীর লিছবীগণ বুদ্ধের ভক্ত হয়ে গেলেন।

এমন সময়ে বুদ্ধদেব শুনলেন পিতা শুন্দোদল কঠিন পীড়ায় অন্তিম শয়্যায়। পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কানে শোনালেন নির্বাণ তত্ত্ব। পিতা দেহত্যাগ করলেন। মাতা গৌতমী চাইলেন সঙ্গে যোগদান করতে। বুদ্ধের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দের অনুরোধে মাতা প্রবেশাধিকার পেলেন।

বুদ্ধের সঙ্গে যেমন স্থান পেয়েছিলেন বিশ্বান সমাজের প্রতিষ্ঠাবান নরনারী, ঠিক তেমনই সমাজের ঘৃণিত, পদব্যাদাহীন নরনারীও তাঁর অপার করণা পেয়ে ধন্য হয়েছিল। সুদাস মালী বুদ্ধের চরণে অসময়ের পদ্মফুল নিবেদন করে বুদ্ধের আশীর্বাদ পেয়েছে। নরসুন্দরতনয় উপালি রাজকুমারদের সঙ্গে একই মর্যাদা লাভ করেছে।

বৈশালী লিছবীদের দেশ। এখানে বাস করতেন আশ্রমালী। বুদ্ধের উপদেশের কথা শুনে সমাজের ঘৃণিতা নর্তকী আশ্রমালীর মন বদলে যায় এবং একদিন বুদ্ধদেবকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করেন। নর্তকীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে বিপক্ষ দল কুৎসা রটাতে পারে এবং শিষ্যরা কিছু ভাবতে পারে। কিন্তু সত্ত্বের উপাসক করণাঘন বুদ্ধ, সমগ্র জীবজগতের কল্যাণের জন্য কোনও দ্বিধা সংকোচ মানলেন না। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং আশ্রমালীর বাড়িতে এলেন। বুদ্ধের দয়া দেখে আশ্রমালী ভক্তিতে লুটিয়ে পড়লেন। অবশেষে আশ্রমালী বিরাট আমবাগানটি সভ্যকে দান করলেন।

সেকালে কোশলরাজ্য ছিল রাজা প্রসেনজিতের। রাজা প্রসেনজিঁ তাঁর রাজ্যের এক দস্যুকে কিছুতেই শায়েস্তা করতে পারেননি। দস্যু অঙ্গুলিমাল থাকত বনে। তার গলায় থাকত মানুষের কাটা আঙুলের মালা, পথিকের যথাসর্বস্ব লুট করে তাকে হত্যা করে তার হাতের আঙুলগুলি কেটে নিয়ে মালা করে পরত গলায়। এজন্য তার নাম অঙ্গুলিমাল।

কোশলরাজ্যে যাবার সহজ পথ ছিল ভীষণ বনের মধ্য দিয়ে। বুদ্ধদেব চললেন কোশল রাজ্য এই বনের মধ্য দিয়ে। ভিক্ষুরা আতঙ্কে শিউরে উঠে বুদ্ধকে সাবধান করলেন, এই বনে দস্যু অঙ্গুলিমাল থাকে। শিষ্যদের

অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে শিষ্যদের সঙ্গী হতে বারণ করে বুদ্ধদেব চললেন বনের গভীরে।

বনের অধিবাসীরাও বাধা দিল। কিন্তু কোনও বাধা মানলেন না তিনি। বুদ্ধ চললেন ধীর পদে। অনেক দূর যাওয়ার পর শুনলেন এক তীব্র কঠস্বর। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন এক ভীষণ মৃত্তি। গলায় রক্তাক্ত আঙুলের মালা। চোখ দিয়ে আগুন বেরচ্ছে। হাতে চকচকে খড়া। অঙ্গুলিমাল কিন্তু সৌম্য-সুন্দর হাসিভরা মুখখানি দেখে স্তুতি হল। এল তার মধ্যে পরিবর্তন। সে বুদ্ধের শরণাগত হয়ে শিষ্যস্ত্র গ্রহণ করে সঙ্গে যোগদান করল।

এক সময় বুদ্ধ শ্রাবণ্তীর নদীতীরে নির্জনে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর সামনে মরা ছেলেকে নিয়ে এলেন এক নারী। বুদ্ধের প্রশ্নে নারী জানালেন, তাঁর নাম কৃশা-গৌতমী। মৃত সন্তানকে বুকে নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি— তাঁর সন্তানের প্রাণভিক্ষা চাইলেন বুদ্ধের কাছে। বুদ্ধদেব তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন—নশুর জীবজগতের এই নিয়ম। শোকাকুলা কৃশা-গৌতমীর কাছে বুদ্ধের সকল যুক্তি ব্যর্থ হল। তখন বুদ্ধ বললেন, এমন গৃহ থেকে একমুঠি সরিয়া সংগ্রহ করে আনতে হবে যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করেনি।

অধীরা সেই নারী ছুটলেন দ্বারে দ্বারে। সময় অতীত হল—প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল। কিন্তু এমন দ্বার মিলল না যেখানে মৃত্যুর স্পর্শ না এসেছে। সন্তানহারা মা বুঝেছেন—মৃতুর হাত থেকে কেউই রক্ষা পায় না। তখন গৌতমের চরণে তিনি আশ্রয় চাইলেন। বুদ্ধ আশীর্বাদ করলেন— কৃশা-গৌতমী ভিক্ষু হলেন।

ধীরে ধীরে বুদ্ধের আবির্ভাব সার্থকতার পথে এগিয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার কাজও চলতে লাগল। প্রায় পঁয়তাঙ্গিশ বছর বুদ্ধদেব সৎ-ধর্ম প্রচার করলেন। বুদ্ধদেব অবশেষে বললেন, তাঁর জীবনের সঙ্গ্য ঘনিয়ে আসছে, আশি বছর বয়স হয়েছে। তিনি চললেন পাবা প্রামের দিকে, পাবা প্রামের একটি সুন্দর আমবাগান তাঁর বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট হল। এই আমবাগানের মালিক চুন্দ দীনভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধদেব আগ্রহভরা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। চুন্দের গৃহে আহার করে বুদ্ধদেবের হল আমাশয়। শরীরের দারণ যন্ত্রণা সহ্য করেই তিনি এবার ধীরে ধীরে চললেন কুশীনগরে। যুগ-যুগান্তরের কুশীনগর। কুশীনগরে পরিনির্বাণ-মঞ্চে শয়ন

করলেন বুদ্ধদেব। তিনি বললেন যে এই তাঁর শেষ শয়ন। সকলে হায় হায় করে উঠল। পার্শ্বেই প্রিয় অনুচর আনন্দ। আনন্দ শোকবিহুল। বুদ্ধদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। ধীরে ধীরে এল মহা নীরবতা। সমাধিমগ্ন বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণে প্রবেশ করলেন।

ভগবান বুদ্ধ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, অত্যন্ত সম্পদশৃষ্ট। তিনি পৃথিবীকে তাঁর ভাবরাশি দ্বারা প্লাবিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্ম ছিল ভিক্ষুধর্ম। ভারতের সর্বত্র আজ যে ভিক্ষুবেশের সমাদর, এ শুধু বুদ্ধের কৃপায়। তিনিই সর্পথম সভ্যজীবন প্রবর্তিত করলেন। সামাজিক সাম্যাই বুদ্ধের অসাধান্য অবদান। যে হৃদয় বৈদিক যুগে দেখা যায়নি, তাই পাওয়া গেল বুদ্ধের মধ্যে।

বৌদ্ধদর্শনের উচ্চতর চিন্তার মধ্যে যে শিল্পবোধ, যে সূক্ষ্ম সুকুমার সৌন্দর্যবোধ অন্তর্নিহিত, তাই ভারতের চিন্তাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে। বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণধর্মের মধ্যে বিচ্ছেদই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। আজ আমাদের ব্রাহ্মণধর্মের সুতীক্ষ্ণ মেধার সঙ্গে মহামানব বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়, উদার প্রাণ এবং অন্তুত মানবিকতার সমন্বয় সাধন করতে হবে।

মানুষের স্বাধীনতাকে, তার চিন্তার স্বাধীনতাকে বুদ্ধ এমনই শৃঙ্খা করতেন যে, মহাপরিনির্বাণের ক্ষণকাল পূর্বেও তিনি কোনও শিষ্যকে সভের অধিনায়ক মনোনীত করতে অস্থীকার করে ভিক্ষুদের বললেন—‘ধর্মই তোমাদের গুরু, ধর্মকে আদর্শ করে তোমরা নিজের শরণ নিজে হও, নিজেকে দীপ করে আলো (অন্তীপো ভব)।’ ভারতবর্ষের সনাতন বাণী ও নীতিকে বুদ্ধদেব স্বীয় আদর্শ ও চরিত্রের প্রভাবে এক অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

বুদ্ধদেবের বাণী

হত্যা করবে না। চুরি করবে না। দুনীতি পরিহার করবে। মিথ্যা বলবে না। মিথ্যা সাক্ষি দেবে না। কটুবাক্য বলবে না। অনেস আড়া দেবে না। অন্যের ধনে লোভ করবে না। বিদ্রেষ করবে না। সম্যক চিন্তা করবে।

যার প্রয়োজন তাকে দান করো। নীতি-উপদেশ মেনে চলো। সৎ-চিন্তা করো। অন্যের সেবা করো। পিতা-মাতা ও গুরুজনদের সম্মান জানাবে ও সেবা করবে। সৎ-বাক্য শ্রবণ করো। সৎ-উপদেশ প্রদান করো। নিজ দোষ সংশোধন করো।

তথাগত কৃচ্ছসাধনে মুক্তি চায় না। তার মানে এই মনে কোরো না, সে জাগতিক সুখভোগ ও প্রাচুর্যে বাস করতে চায়। তথাগত ‘মধ্যপন্থা’ আবিস্কৃত করেছে।

পদ্মপাতা জলে থাকলেও জল তাকে স্পর্শ করে না। অপরপক্ষে, সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখভোগ মানুষকে দুর্বল করে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি তার কামনার দাস। সুখভোগেছ্বা নীচ ও কদর্য।

তবে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো দোষাবহ নয়। শরীরকে সুস্থ রাখা কর্তব্য, নতুবা আমাদের জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকবে না এবং মনও স্বচ্ছ ও শক্তিশালী হবে না। একেই বলে ‘মধ্যপন্থা’। কোনও কিছুর চূড়ান্ত ভাল নয়।

যে স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে পেরেছে, শান্তি এবং সত্যকে লাভ করেছে, সেই সুখী।

সত্য মহান ও মধুর। সত্যই একমাত্র দুঃখদুর্দশা থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারে। সত্য বাতীত জগতে উদ্বারকর্তা আর কে আছে ?

তোমার দুঃখের কারণ যাই হোক না কেন, অপরকে আঘাত কোরো না। অপরের প্রতি শুভেছ্বা প্রকাশই ধর্ম। সর্বপ্রাণীর প্রতি অন্তরের অসীম মৈত্রী পোষণ করো।

সকলেই সুখ চায়, অতএব, সকলের প্রতি করণা প্রদর্শন করো। দ্বেষের দ্বারা দ্বেষকে জয় করা যায় না। একমাত্র ভালবাসাতেই দ্বেষকে জয় করা যায়। এটাই চিরাচরিত নিয়ম।

তৃষ্ণ, দ্বেষ এবং মোহ—এগুলিই হল অনর্থের মূল।

ପ୍ରଚାରକ ଅପରକେ ଖର୍ବ କରବେ ନା, ଦୋଷ ଦେବେ ନା, କୁଂସା ରଟାବେ ନା ଏବଂ
କଟାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରବେ ନା ।

ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଥେକେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ସାଧନେ ତୃପର ହୁଏ । ଜୀବନ, ଧନ-ସମ୍ପଦ ବା କ୍ଷମତା ମାନୁଷକେ ବନ୍ଦ କରେ ନା । କିନ୍ତୁ ଏଗୁଲୋର ପ୍ରତି ତୀର ତୃଷ୍ଣାଇ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ମାନୁଷକେ ବନ୍ଦ କରେ ।

স্বাস্থ্যই সম্পদ, সন্তোষ সর্বোচ্চ ধন; গোপনীয়তা পরম আত্মীয় এবং নির্বাণই
পরম ও চরম আনন্দ।